দুই মুক্তিযোদ্ধা

ইমদাদুল হক মিলন

তোমার নাম কী?

রতন। রতন মৃধা।

বাড়ি কোথায়? মানে কোন গ্রামে?

বাড়ি তো আছিলো সাহেব কনকসার। এখন আর নাই। পদ্মায় ভাইঙ্গা নিছে।

এখন তাহলে থাকো কোথায়?

থাকি সাহেব পথের ধারে। কুমারভোগ চৌরাস্তা থেকে লৌহজংয়ের দিকে গেছে। যেই রাস্তা সেই রাস্তার পাশে ছাপরা উঠাইছি। আমার মতন বহুত নদীভাঙা মানুষ ওইরকম ছাপরা উঠাইছে রাস্তার ধারে। ওইভাবেই থাকি।

লৌহজং এলাকাটা প্রতিবছরই ভাঙছে। গতবছর উপজেলা ভবনটবন সব চলে গেছে নদীতে। এদিককার কত বিখ্যাত গ্রাম যে এখন আর নেই। এভাবে ভাঙতে থাকলে বিক্রমপুর অঞ্চলটাই একসময় বিলীন হয়ে যাবে। নদী ভাঙার ফলে আদি বিক্রমপুরের অর্ধেকটাও নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও বুঝি যায় যায়।

আপনি সাহেব যাবেন কোনদিকে?

রতনের কথাটা শুনেও শুনতে পাই না আমি। সে তার মতো করে রিকশা চালাচ্ছে, আমি আছি উদাস হয়ে। আসলে

কোনদিকে যে যাব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বিকেলের মুখে মুখে মুনিরদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। মুনির ছিল সঙ্গে। সে আমার মামাতো ভাই। অল্প বয়েসি ছেলে। আমাকে ডাকে দাদা। অত্যন্ত প্রাণবন্ত, কর্মঠ ছেলে। আলস্য কাকে বলে জানে না। রাত দুপুরেও যদি কোনও কিছুর দরকার হয়, কিচ্ছু না ভেবে, কারও সাহায্য না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেই জিনিস জোগাড় করে আনবে।

আজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুনির বলল, চলেন দাদা, বাজারের দিকে যাই। আড্ডাফাড্ডা দিয়াসি।

বাজারের দিকে যেতে আমার ইচ্ছে করছিল না। মাওয়ায় এখন কী আর সেই ছোট্ট নির্জন বাজার আছে! মাওয়া এখন বিশাল গঞ্জ এলাকা। আধা শহর বললেও ভুল হবে না। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক হওয়ার ফলে মাওয়া এখন দেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। লোকের মাথা লোকে খায় এমন ভিড় শুধু দিন দুপুরে না, রাত দুপুরেও। আমি গ্রামে এসেছি নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্য। ঢাকা শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে একটুখানি নির্বাসন, একটুখানি একা, নিজের মতো করে কয়েকটা দিন কাটানো। এই অবস্থায় বাজারের লোকজন, হৈ হল্লা ভাল লাগবে না। ভাল লাগবে একা একা ঘুরে বেড়াতে। নির্জন নদীতীরে গিয়ে যদি একটু বসে থাকা যায়! রিকশা নিয়ে সারাটা বিকেল যদি একটু ঘুরে বেড়ানো যায়! কোথাও পথের ধারে ছাপরা ঘরের চায়ের দোকান পেলে সেখানে দাঁড়িয়ে যদি এককাপ চা খাওয়া যায়! আমি আসলে এরকম চাচ্ছি।

মুনিরকে বললাম কথাটা।

শুনে বলল, নির্জন নদীতীর এইদিকে পাইবেন না দাদা। চারদিকে খালি মানুষ। ঢাকা থেকে বিকালবেলা বেড়াইতে চইলা আসে লোকে। তারচে' আপনে রিকশা লইয়া ঘুইরা বেড়ান। রাস্তায় চলেন, রিকশা ঠিক কইরা দিতাছি।

এই রিকশা মুনিরই ঠিক করে দিয়েছিল। মাওয়ার দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে রিকশা চালাতে বলেছিলাম আমি। তারপর কথা বলতে শুরু করেছিলাম রতনের সঙ্গে। সীতারামপুরের দিকটায় এসে রতন জানতে চেয়েছে আমি কোনদিকে যাব?

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, যাও তোমার যেদিকে ইচ্ছা। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরবা। তারপর যেখান থেকে উঠেছি সেখানে নামিয়ে দিও।

আইচ্ছা।

রতন তারপর কাজির পাগলার দিকে রিকশা চালাতে শুরু করেছে।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে এই এলাকায়। মেদিনী মণ্ডলে নানাবাড়িতে থাকতাম, পড়তাম কাজির পাগলা হাইস্কুলে। তখনকার সেই নিঝুম নির্জন গ্রামগুলোর সঙ্গে আজকের এইসব গ্রামের কোনও মিল নেই। খাল ডোবা নালা ভরে সুন্দর রাস্তা হয়েছে। বিক্রমপুরের ঐতিহ্য টিনের ঘরদোর আছে কিছু, তবে অনেক বাড়িতেই সুন্দর সুন্দর দালানকোঠা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যে এলাকার মানুষ সবচাইতে বেশি টাকা পয়সার মালিক হয়েছে সেই এলাকার নাম বিক্রমপুর। যদিও সরকারি নথিপত্রে বিক্রমপুর নামটাই এখন আর নেই, বহু বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিক্রমপুর আছে মানুষের মুখে মুখে। বিক্রমপুরের লোক শুনলেই লোকে মনে করে টাকাঅলা লোক। বিক্রমপুরে কোনও গরিব মানুষ নেই।

কথাটা পুরোপুরি সত্য না। বিক্রমপুরে গরিব মানুষও আছে। সংখ্যায় কম, কিন্তু আছে। এই যে রতন রিকশাঅলা সে তো আসলে গরিব মানুষই। হয়তো একসময় সচ্ছল ছিল, নদীর ভাঙনে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

আমাদের ছেলেবেলায় কাজির পাগলা বাজারটি বেশ জমজমাট ছিল। আমির খাঁর মুদিমনোহারি দোকান, জলধর ডাক্তারের ডিসপেন্সারি, গান্ধি ঘোষের মিষ্টির দোকান। পশ্চিম দিক দিয়ে বাজারে ঢোকার মুখে ছিল করিম ডাক্তারের ডিসপেন্সারি। একটা চন্দন গোটার গাছ ছিল, খালের দিকে ঝুঁকে ছিল একজোড়া বউন্নাগাছ। এখন সেসব গাছের জায়গায় দুতিনটে আমগাছ, একটা জামগাছ। জামগাছটির তলায় ছাপরাঘরে চায়ের দোকান দিয়ে বসেছে একলোক। আমি যে ধরনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার কথা ভেবেছিলাম, দোকানটি ঠিক তেমন। কিন্তু কোনও কাস্টমার নেই। চুলোর সামনে বসে সিগ্রেট টানছে দোকানি।

রতনকে বললাম, রিকশা রাখো। আমি এককাপ চা খাব।

দোকান পর্যন্ত রিকশা গেল না। একটুখানি জায়গা ভাঙা। রতন রিকশা দাঁড় করাল একটু দূরে। আমি নেমে গিয়ে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। নিজে এককাপ চা নিয়ে দোকানিকে বললাম রতনকেও এককাপ চা দিয়ে আসতে। দোকানি বলল, লাভ নাই সাহেব। রতন আপনের চা খাইবো না।

কেন?

ও কেউর দেওয়া কোনও জিনিস নেয় না, কেউর দেওয়া কোনও জিনিস খায় না।

কথাটা আমি বুঝতে পারি না। চায়ে চুমুক দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দোকানির দিকে তাকিয়ে থাকি। আপনি চেনেন রতনকে?

জি সাহেব। ভাল কইরাই চিনি। দ্যাশ গেরামে সবাই সবাইরে চিনে।

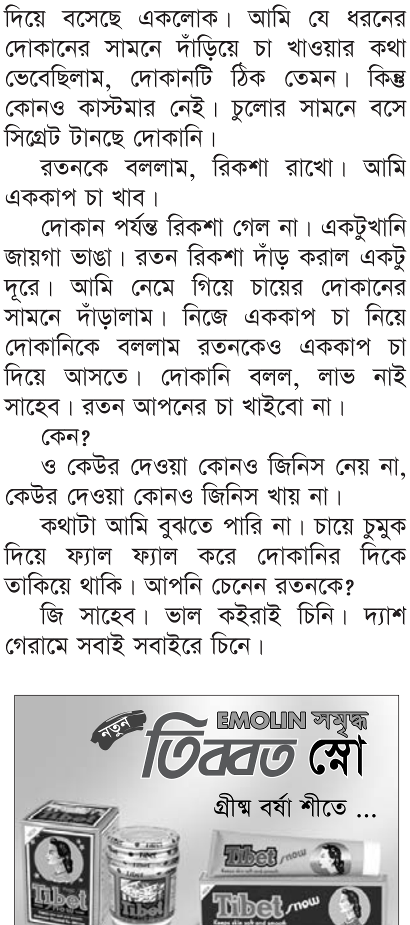

কিন্তু রতন তো এই এলাকার লোক না।

না হইলেও রতনরে দশ বিশ গ্রামের সবাই চিনে। ও খুব নামকরা মানুষ। বিরাট মুক্তিযোদ্ধা আছিল। গোয়ালিমান্দ্রার যুদ্ধে রতন একলাই বিশ তিরিশজন পাকসেনা খতম করছিল।

শুনে আমি হতভম্ব। আমার গলা দিয়ে চা নামতে চায় না, গলা যেন বন্ধ হয়ে গেছে। বলে কী! রতন ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা, দেশ স্বাধীন করেছিল। আর আজ সে রিকশাঅলা। এ কী করে সম্ভব! পেটের দায়ে কোনও কোনও মুক্তিযোদ্ধা মানবেতর জীবনযাপন করে, রিকশা চালায় কেউ, ফেরিওয়ালা হয়েছে কেউ এই ধরনের খবর হঠাৎ হঠাৎ পত্রপত্রিকায় আসে। আজ সেই রকম একজন মানুষ আমার সঙ্গে! তার রিকশায় চড়ে হাওয়া খাচ্ছি আমি! আশ্চর্য এক অপরাধবোধ হয় আমার।

দোকানি বলল, রতন যে মুক্তিযোদ্ধা আছিল এই কথা ও সহজে কেউরে কয় না। ও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেয় নাই। অস্ত্র জমা দেওনের পর সাধারণ মানুষ হইয়া গেছে। সরকারি কোনও সুযোগ সুবিধাও নেয় নাই। কোনও রকমের সাহায্য সহযোগিতা নেয় নাই কেউর থিকা।

কেন?

তা জানি না। তয় খুবই সৎমানুষ রতন। নিজে রিকশা চালাইয়া খায়, অসুখ বিসুখ হইলে রিকশা চালাইতে পারে না, বাড়িতে কোনও কোনওদিন রান্ধন হয় না, তাও কেউর কাছে হাত পাতবো না। সাহায্য তো দূরের কথা, ধার উধারও নিব না কেউর কাছ থিকা। স্বভাবটা আজব পদের। নিজের কথা কেউরে কইতেও চায় না। লেখাপড়া জানে না রতন, তয় জ্ঞানবুদ্ধি বহুত ভাল। কথাবার্তা কইলে ভালই কয়।

সংসারে আছে কে কে?

পোলাপান নাই রতনের। ও হইল নিঃসন্তান। বউটা হাঁপানির রুগি। বচ্ছরে নয়মাসই বিছনায় থাকে। সারাদিন রিকশা চালাইয়া বাড়িত ফিরা রতন আবার রান্ধন বাড়ন করে। বউরে খাওয়াইয়াও দেয়। অবস্থা একসময় ভালই আছিল। নদীর ভাঙনে গরিব হইয়া গেছে। রতনের ভাই বইন আত্মীয় স্বজন অনেকেই আছে ভাল অবস্থায়। রতন কেউর কাছে যায় না। এখন তারাও কেউ আর রতনের কাছে আসে না। রতনের খোঁজ খবর লয় না।

রতনের কথা শুনতে শুনতে পর পর দুকাপ চা খেয়েছি আমি। তারপর রতনের রিকশার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কপালের ফেরে একজন মুক্তিযোদ্ধা আজ রিকশাঅলা এ কথা জানার পর কিছুতেই তার রিকশায় আমি চড়তে পারব না। তাকে আর তুমি করে বলতে পারব না।

আমার ইচ্ছে করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করি রতনকে। কিন্তু দোকানি বলেছে নিজের কথা বলতেই চায় না রতন।

কিন্তু আমাকে তো কয়েকটা কথা বলেছে। নাম ধাম, গ্রাম পরিচয়। জিজ্ঞেস করলে কি আর দুয়েকটা বলবে না।

আমি রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে আছি দেখে

রতন বলল, খাড়াইয়া রইলেন ক্যান সাহেব। রিকশায় ওঠেন। চলেন যাই। বিকাল শেষ হইয়া গেছে।

আমার যে ভাই এখন আপনার রিকশায় উঠতে ইচ্ছে করছে না।

আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল রতন। তারপর হাসল। মোস্তফা তাইলে আমার কথা আপনেরে বইলা ফালাইছে!

মোস্তফা কে?

ওই চায়ের দোকানদার। আমারে চিনে।

কিন্তু আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা… …

রতন হাত তুলে আমাকে থামাল। তাতে কী হইছে? একাত্তোর সালে পাকিস্তানীগ পক্ষের কিছু লোক ছাড়া বেবাকতেই তো মুক্তিযোদ্ধা আছিল। আমি না হয় অস্ত্র হাতে লইয়া যুদ্ধ করছি। যারা অস্ত্র হাতে লয় নাই বা লইতে পারে নাই, মানে প্রাণে দেশের স্বাধীনতা চাইছে তারাও তো মুক্তিযোদ্ধা। সেই অর্থে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বেশিরভাগ মানুষই মুক্তিযোদ্ধা। এইডা লইয়া একলা আমি বড়াই করুম ক্যান?

শুনে আমার মুখে কথা জোটে না। অপলক চোখে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

রতন বলল, আমি লেখাপড়া জানি না। ভাল কাম কাইজ শিখি নাই। নদী ভাঙনের আগে গিরস্তালী করছি। জমাজমি আছিল, ধানপাট চাষ করছি। এখন জমাজমি নাই এইজইন্য রিকশা চালাই। আমার মনে সাহেব কোনও দুঃখ নাই। বেদম একটা সুখ আছে। আমি রিকশা চালাই আমার নিজের দেশে। বাংলাদেশে। নিজের হাত দিয়া এই দেশ স্বাধীন করছি। স্বাধীন কইরা নিজের ইচ্ছামতন রিকশা চালাই। আমার মতন সুখী কে আছে কন! ওঠেন, রিকশায় ওঠেন।

রতনের কথা শুনে আমার বুকটা তোলপাড় করে। এইসব মহান মানুষ ছিল বলেই দেশটা আমাদের স্বাধীন হয়েছে, এইসব মহান মানুষ আছে বলেই দেশটা আমাদের আজও টিকে আছে।

আমার ইচ্ছে করে রতনকে বলি, ভাই, আপনি রিকশায় বসুন। আমি আজ চালিয়ে নিই রিকশা। আপনাকে পৌঁছে দিই আপনার গন্তব্যে। তাতে আমার এ জীবন ধন্য হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, যুদ্ধ করতে পারিনি। আজ একজন মুক্তিযোদ্ধাকে রিকশায় বসিয়ে সেই রিকশা চালিয়ে নিতে পারলে দেশের মানুষের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। আপনি আমাকে সেই সুযোগটা দিন। দেশের প্রতি আমার ঋণ কিছুটা শোধ করার সুযোগ দিন। আমার জীবন ধন্য করুন।

॥ দুই ॥

স্টেজ থেকে নেমে অফিসরুমের দিকে যাচ্ছি, ভিড় ঠেলে ছেলেটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। স্যার, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব। হেডমাস্টার সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, আজ যাও, পরে আসো। স্যার এখন টায়ার্ড।

আমার চারপাশে টিচাররা প্রায় সবাই আছেন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আছেন। স্কুলের মাঠে সাত আটশো ছেলেমেয়ে হৈচৈ করছে। ঘণ্টাখানেক আগে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিটি উদ্বোধন করেছি আমি। তারপর স্টেজে গিয়ে বসেছি। এই ধরনের অনুষ্ঠানে বক্তার অভাব থাকে না। জুন মাসের গরমেও স্যুটটাই পরে বক্তৃতা দিতে চলে এসেছেন এখানকার কেউকেটারা। মাইক হাতে নেয়ার পর কী তেজ একেকজনের! ভুল উদাহরণে অতিশয় জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে। এত বিরক্তিকর সেইসব বক্তৃতা, শুনে চড় মারতে ইচ্ছা করে। তার তো আর উপায় নেই, বরং এদিক ওদিক মুখ করে উল্টো বলতে হয়, দারুণ বলেছেন ভাই। ভেরি ওয়েল সেইড।

ঘণ্টাখানেক ওই জিনিস হজম করে, নিজের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শেষ করে, গরমে ঘামে অস্থির হয়ে স্টেজ থেকে নেমেছি। এখন এককাপ চা খেলে ক্লান্তি কাটবে। ওদিকে স্টেজে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। মাইক্রোফোন টেস্ট করছে কেউ। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি। হাতুড়ি নিয়ে তবলার বাঁধ ঠিক করছে তবলচি আর চাঁটি মেরে মেরে দেখছে বাঁধ জুতমতো হয়েছে কি না! ভাবখানা এইরকম যেন বাজাতে বাজাতে তবলা আজ সে ফাটিয়ে ফেলবে। দুটো মেয়ে ঝলমলে নাচের পোশাক পরে, মুখে কড়া মেকআপ নিয়ে স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাচনে, চোখের চাউনি আর ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ওদের মতো নৃত্যশিল্পী বাংলাদেশে আর একজনও নেই।

এই ধরনের অনুষ্ঠানে গেলে অনেক ধরনের যন্ত্রণা পোহাতে হয় আমাকে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই আমার নাটকে অভিনয়ের বাসনা প্রকাশ করে। টেলিভিশনে কীভাবে ঢোকা যায় সেসব জানতে চায়। কেউ কেউ নিজের লেখা গল্প কবিতা দেখাতে চায়। আর মোবাইল নাম্বার চেয়ে তিতিবিরক্ত করে ফেলে। এই ছেলেটিও নিশ্চয় সেই ধরনের কোনও বিষয় নিয়েই কথা বলতে চায়। ভাল হয়েছে হেডমাস্টার সাহেব তাকে একটা ধমক দিয়েছেন।

অফিসরুমে আমাকে বসতে দেয়া হলো

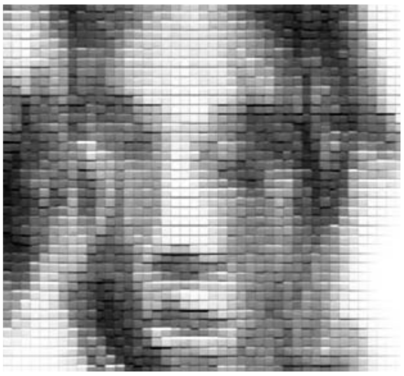

হেডমাস্টার সাহেবের চেয়ারে। পাশে একখানা মুভিং স্ট্যান্ডফ্যান ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। লোকজন যে যার চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন। সামনের টেবিলভর্তি খাবার। ছোট সাইজের আপেল টুকরো টুকরো করে কেটে ডাঁই করা হয়েছে প্লেটে, খোসা ছাড়ানো কমলারও একই দশা। সবরি কলা আছে, কেক বিস্কিট আছে। আর আছে গ্লাসভরা কোক, ছোট ছোট মিনারেল ওয়াটারের বোতল। দুটো টিস্যু পেপারের বক্সও আছে। মোট কথা এলাহি কাণ্ড।

কিন্তু এইসব খাবারের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। আমি চাচ্ছি এককাপ চা। লেবু চা হলে সবচাইতে ভাল হয়।

বললামও কথাটা।

হেডমাস্টার সাহেব বিনয়ের অবতার হয়ে বললেন, আগে এসব একটু মুখে দেন স্যার। লেবু চা আসবে।

সেই চা এলো পাঁচ সাত মিনিট পর। মাত্র চুমুক দিয়েছি, সেই ছেলেটি এসে দাঁড়াল অফিসরুমের দরজায়। আমার দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, স্যার…

হেডমাস্টার সাহেব আবার তাকে একটা ধমক দিলেন। তোমাকে না বললাম…

এই প্রথম ছেলেটির দিকে তাকালাম আমি। তাকিয়ে বেশ একটা ধাক্কা খেলাম। চেহারাটা কেমন যেন পরিচিত। আমার চেনা কার সঙ্গে যেন এই চেহারার খুব মিল। কিন্তু কার সঙ্গে, ঠিক মনে করতে পারছি না।

ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। হেডমাস্টার সাহেব হয়তো আবার তাকে ধমক দেবেন, তার আগেই আমি বললাম, এসো, ভেতরে এসো। বলো কী বলবে।

আমি মনে মনে খুঁজছি কার সঙ্গে ওর চেহারার মিল। কার সঙ্গে!

ছেলেটি ভেতরে ঢুকে বলল, স্যার, আমার বাবার নাম মতি। মতি মাস্টার। আপনি তারে চিনেন।

সঙ্গে সঙ্গে মতি মাস্টারের কথা মনে পড়ল আমার। সত্তর সালে আমাদের গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে লজিং থেকে জগন্নাথ কলেজে বিএ পড়তেন। অতি অমায়িক সজ্জন মানুষ। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। পড়াতেন যেমন ভাল, দেখতেও ছিলেন তেমনি ভাল। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। আমাকেও ভালই পড়াতেন। তবে

অঙ্কটা তেমন জানতেন না। অন্যান্য সাবজেক্ট ভাল পড়াতেন। বিশেষ করে বাংলা। এই ছেলেটির মুখখানি যেন হুবহু সেই সময়কার মতি মাস্টার। কিন্তু তিনি যে এই এলাকার লোক তা তো আমার জানা ছিল না। তাছাড়া স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর কেটে গেছে মতি মাস্টারের সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই আমাদের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। শুনেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি। দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হয়নি। এই ছেলেটিকে দেখে আমি সেই সময়কার মতি স্যারের কাছে ফিরে গেলাম। স্মৃতিকাতর গলায় বললাম, তুমি মতি স্যারের ছেলে! কী নাম তোমার?

মিজান।

আমার কথা কি তোমার বাবা বলেছেন?

জি। বলেছিলেন অনেক আগের কথা। ওকে তো আমি কিছুদিন পড়িয়েছি। সে কথা মনে আছে কি না কে জানে? তুই গিয়ে আমার পরিচয় দিস।

আমার মনে আছে। সব মনে আছে। স্যার আছেন কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে মিজানের মুখ কেমন দুঃখী হয়ে গেল। সে কথা বলবার আগেই ম্যানেজিং কমিটির লিয়াকত সাহেব বললেন, না, মতিভাই ভাল নাই। তার ক্যান্সার হইছে। লিভার ক্যান্সার।

শুনে আমি একেবারে নিভে গেলাম।

মিজান বলল, আপনি এই স্কুলে আসছেন শুনে বাবা বলল, পারলে আমি যেন আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই। আপনাকে দেখতে চাইলেন।

আমি যাব। অবশ্যই যাব।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমরাও যাই স্যার আপনার সঙ্গে। বেশি দূর তো নয়। মতি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসে এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন, গাড়ি তো থাকবেই, তারপর এখান থেকে চলে যাবেন।

ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান বকর সাহেব বললেন, আমার গাড়িটা নিয়ে যান।

মিজান বলল, আমাদের বাড়ির দিকটায় গাড়ি যায় না। যেতে হবে হেঁটে।

হেঁটে? না না, উনি হাঁটতে পারবেন না।

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি পারব। আমার কোনও অসুবিধা হবে না। আপনাদের কারোরই আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। আমি মিজানের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব। চলো মিজান।

আমার ব্যবহারে টিচার এবং কমিটির লোকজন অবাক হলো। প্রধান অতিথির এ কী আচরণ!

কিন্তু আমি কারও দিকে ফিরে তাকালাম না। মাঠের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ। জুন মাসের রোদে ঝিমঝিম করছে চারদিক। মিজানের সঙ্গে পা চালিয়ে হাঁটছি আমি। হাঁটতে হাঁটতে টুকটাক কথা হচ্ছে।

মিজান, তোমার ক ভাইবোন?

আমি একাই।

কী করছ তুমি? পড়াশুনা শেষ করেছ?

বিএ পাস করছি। বাবা তো আমাদের সরকারি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার ছিল, সেই স্কুলে আমার চাকরি হয়েছে। কিন্তু অবস্থা ভাল না আংকেল। বিষয়সম্পত্তি একসময় ভালই ছিল আমাদের। বাবার চিকিৎসায় সব গেছে। এখন আমার রোজগারে কোনও রকমে সংসার চলে।

স্যারের চিকিৎসা করাতে পারছ?

ক্যান্সারের আর চিকিৎসা কী করাব! যতদূর পারছি করছি। ঢাকা মেডিক্যালে নিয়া রাখছিলাম কিছুদিন। বাবায় থাকতে চাইলো না। বাড়িতে চইলা আসলো। এমন অনুরোধ কইরা কইল, না আইনা পারলাম না।

এখন অবস্থা কী রকম?

ওই যে বললাম। এখন যে কয়দিন থাকে আর কী?

কথাবার্তা বলতে পারে? লোকজনকে চেনে?

জি, ওইসব ঠিক আছে। স্মৃতিশক্তিও ভাল। আপনের কথা শুইনা আমারে পাঠাইছিলো।

ততক্ষণে মতি স্যারের বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা। একেবারেই দরিদ্র ধরনের বাড়ি। ভাঙাচোরা দুটো টিনের ঘর। উঠোনের এক কোণে রান্নাবান্না। কয়েকটি মুরগি রয়েছে উঠোনে। আর প্রচুর গাছপালা বাড়িটায়। বেশ স্নিগ্ধ শান্ত একটা পরিবেশ। বড়ঘরের পেছন দিককার জামগাছে বসে একটা কাক ক্লান্ত গলায় ডাকছিল।

কিন্তু মতি স্যারকে দেখে আমি চিনতে পারি না। এই কি সেই মানুষ!

বিছানায় পড়ে আছে শুকনো একটি কংকাল! মাথায় সামান্য কয়েকটি সাদা চুল, গোঁফ দাড়ি কাঁচাপাকা। মুখটা ভেঙে শামুকের মতো হয়ে গেছে। হাত পা যেন শুকনো কোনও ঝোপঝাড়ের ডালপালা। কিন্তু চোখ দুটো আশ্চর্য রকম চকচকে। গলার আওয়াজে কোনও মালিন্য নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব খুশি হয়েছি। আমার কথা তুমি যে মনে রেখেছ, এত বড় মানুষ হয়েও যে আমাকে দেখতে এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি। খুব খুশি হয়েছি।

আমি এই ঘরে ঢোকার পরই স্যারের স্ত্রী তাঁকে বিছানায় তুলে বসিয়েছেন। মিজান তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে একটি চাদর। পুরনো দিনের পালঙ্কে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছেন তিনি। আমি বসেছি তাঁর পাশে।

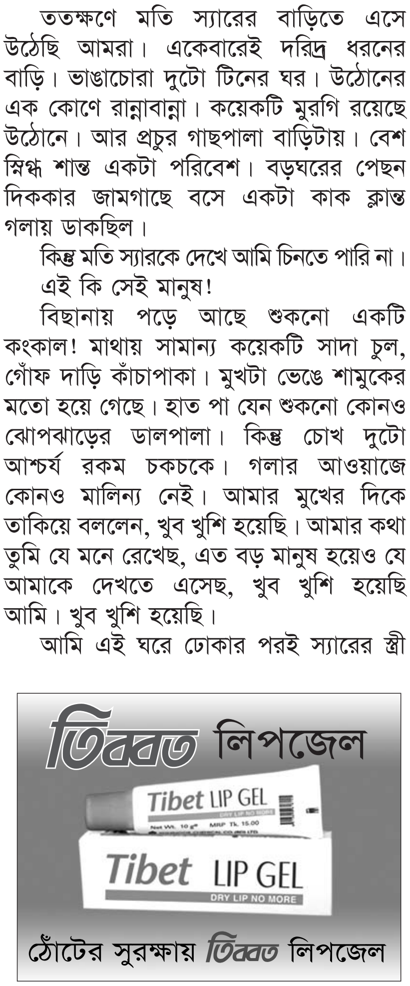

কিন্তু আমার কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করে না। স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ফিরে গেছি দূর অতীতে। তখন যৌবন ছিল মতি মাস্টারের। তখন যুদ্ধে যাবার সময় ছিল তাঁর।

মতি স্যার টেনে টেনে বললেন, সত্তর সালের পর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ঠিকই কিন্তু তোমার সব খবর রাখি আমি। খুব ভাল লাগে যে তুমি একসময় আমার ছাত্র ছিলে।

আমারও স্যার আপনার কথা মনে ছিল। আপনার কথা ভেবে খুব গৌরববোধ করতাম।

কীসের গৌরব? গৌরব করার মতো কী করেছি আমি?

মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, দেশ স্বাধীন করেছেন।

স্যার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তা ঠিক। আমার জীবনের ওই একটিই বড় কাজ। আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। দেশ স্বাধীন করতে পেরেছিলাম। মানুষ হিসেবে দুটো বড় ঋণ থাকে মানুষের, এক নিজের মায়ের ঋণ, আরেক দেশ মায়ের ঋণ। নিজের মায়ের ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি। আমি যখন খুব ছোট তখন আমার মা মারা যান। কিন্তু দেশ মাতৃকার ঋণ আমি কিছুটা শোধ করেছি দেশ স্বাধীন করে। এই অর্থে আমি খুব সুখি মানুষ।

খানিক কথা বলেই পেট চেপে ধরছিলেন স্যার। মুখে ফুটে উঠছিল তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। সেই যন্ত্রণা চেপে কথা বলে যাচ্ছিলেন। যেন আমাকে অনেক কথা বলার আছে তাঁর।

তুমি তো লেখক, আমার একটা অনুভূতির কথা তোমাকে খুব বলতে ইচ্ছে করছে।

বলুন স্যার, বলুন।

সকালবেলা তোমার ভাবী আমাকে উঠোনের কোণে বসিয়ে রাখে। ক্যান্সারের ব্যথায় আমি সারাক্ষণ ছটফট করি। কিন্তু উঠোনের মাটিতে বসার পর সেই ব্যথাটা আমার কেমন যেন কমে আসে। মাটি যেন আশ্চর্য এক মমতা ছড়িয়ে দেয় আমার শরীরে। সেই মমতার গুণে ক্যান্সারের ব্যথা ভুলে যাই আমি। বুঝতে পারি স্বাধীন দেশের মাটির এই গুণ। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ যেমন মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শান্তি পায়, উঠোনের মাটিতে বসে ঠিক সেই শান্তিটাই পাই আমি। সুনীলের একটি কবিতার লাইন মনে আসে, 'বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ, এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি'। আমার জীবনের সবচাইতে বড় প্রাপ্তি কী জানো, আমি আমার নিজ হাতে স্বাধীন করা দেশের মাটিতে মরতে পারছি। এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি।

স্যারের কথা শুনে আমার বুকটা তোলপাড় করে, চোখ দুটো ছলছল করে। মনে মনে বাংলাদেশকে আমি বলি, প্রিয় বাংলাদেশ, মতি স্যারের মতো সন্তান জন্ম দিয়ে তুমি তোমার মাটিকে ধন্য করেছ।

অলংকরণ : **কনক আদিত্য**